কাহিনী বা ঘটনা-পরম্পরার বৈপরীত্যে শ্যামা ও মিন্টু চরিত্র দু'টির স্বরূপ বিনির্মাণের সমান্তরালে ষাটের দশকের বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় চৈতন্য ও সমকালীন রাষ্ট্রিক উৎকণ্ঠাকে উপজীব্য করে ঔপন্যাসিকের এক অভিনব শিল্পপ্রয়াস গুরুত্ব পায় *শ্যামা* উপন্যাসে। ফলে *শ্যামা* নর-নারীর অচরিতার্থ প্রেমের আলেখ্য হয়েও দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধের এক অনন্য প্রতিভাস। জীবনবোধ ও জীবনের বিস্তৃতি বিচারে, ব্যক্তির অনালোকিত মনোবাস্তবতা উন্মোচনে, ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনায়, কিংবা আঙ্গিক গঠনে ঔপন্যাসিকের নিরীক্ষাপ্রবণতায় স্বল্পপ্রাণা *শ্যামা* নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং বাংলাদেশের উপন্যাসসাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার দাবিদার।

তথ্য নির্দেশিকা

১. উপন্যাস-সমগ্র : রশীদ করীম, অক্টোবর ২০০২, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ.৭৭১
২. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৮০
৩. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৭২
৪. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৭৬
৫. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৭৮-৭৭৯
৬. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৭৯
৭. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৯০
৮. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৭১-৭৭২
৯. পূর্বোক্ত, পৃ.৮০১
১০. সুস্মিতা ইসলাম, 'একটি প্রেমের উপন্যাস : *সোনার পাথর বাটি*', দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকা, ৭অক্টোবর১৯৯৪, ঢাকা
১১. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৮৭-৭৮৮
১২. গুণময় মান্না, 'এক মুঠো : রশীদ করীমের তিনটি লেখা', জিজ্ঞাসা, সম্পাদক : শিবনারায়ণ রায়, পঞ্চম বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৯১, পশ্চিমবঙ্গ, পৃ.৪৮৬
১৩. উপন্যাস-সমগ্র : রশীদ করীম, পৃ.৭৭৬
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ.৮০১-৮০২
১৫. সুস্মিতা ইসলাম, পূর্বোক্ত
১৬. উপন্যাস-সমগ্র : রশীদ করীম, পৃ.৭৭৯-৭৮০
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৮২
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৮৬
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৯৫
২০. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৯১
২১. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৯৫-৭৯৬

ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 05. No. 01. February 2011

ভাষা দর্শন : ভাষিক প্রকৃতিবাদ—একটি দার্শনিক বিশেণ্ডষণ

মো: সুলতান মাহমুদ*

মো: মতিউর রহমান**

সারসংক্ষেপ: ভাব প্রকাশের বা আদান-প্রদানের প্রধান বাহন হচ্ছে ভাষা। জগৎ তথা আমাদের সমাজে নানা ধরনের ভাষাভাষী মানুষের বসবাস। ব্যক্তিকে তার পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে চলতে ফিরতে বিভিন্ন রকম ভাষা ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়। বিশেণ্ডষণী দার্শনিকরা মনে করেন, মানুষের জীবন কেন্দ্রিক সমস্যার প্রধান সমস্যা হচ্ছে ভাষা কেন্দ্রিক। কারণ একজনের কাছে অন্যজনের ভাব-ভাষা পরস্পর অনুধাবনের অনুপযোগী হওয়ায় আমাদের সমাজের নানামুখী সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয় না। তাই এই সকল সমস্যা সমাধান কল্পে ভাষার আবর্তিত বিবর্তিত রূপের যে যৌক্তিক আলোচনার সহজ ফলাফল-তা ভাষা দর্শনের মাধ্যমে করা সম্ভব বলে মনে করা হয়। এখানে যৌক্তিক দৃষ্টবাদী দার্শনিকদের অন্যতম দার্শনিক Ludwig Wittgenstein এর অনুসরণে ভাষিক প্রকৃতিবাদ কিভাবে ভাষিক সমস্যার সমাধান করে তা অতিসংক্ষেপে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ভাষার একটি নির্দিষ্ট কাঠামো থাকে, যা ভাষা বোঝার জন্য এক ধরনের অপর্যাপ্ততা। অতএব এই চিরাচরিত কাঠামোকে ভেঙ্গে চুরমার করে প্রকৃতিগতভাবে ভাষাকে ব্যবহার করে তার ভাষিক সমস্যার সমাধান করা যায় তা আলোকপাত করাই হচ্ছে আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মানুষের মনের ভাব আদান-প্রদান ও জ্ঞান অর্জনের প্রতীকময় মাধ্যমকে ভাষা বলা হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, যার সাহায্যে আমাদের অভিজ্ঞতা ও মনের ভাব প্রকাশ পায় তাই হচ্ছে ভাষা। অর্থাৎ জনসমাজে ব্যবহৃত মনের ভাব প্রকাশক ধ্বনিকে বা ধ্বনির লিখিত রূপকে ভাষা বলা হয়। দৈনন্দিন জীবনে চিন্ড়ার বিকাশ, প্রকাশ এবং পারস্পরিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। আবার বিশেষ বিশেষ চিন্ড়ার সচেতনতা বৃদ্ধি ও গুরুত্ব এবং তাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে ভাষার প্রসার অপরিহার্য। ভাষাকে আমরা স্বাভাবিক ও কৃত্রিম দুইভাবে দেখতে পাই। প্রাত্যহিক জীবনের ছন্দে-আনন্দে, যাতনায়-চেতনায়, চিন্ড়ার বিকাশে, পারস্পরিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি তা হচ্ছে স্বাভাবিক ভাষা। অপরদিকে অঙ্কের চিহ্ন, পদার্থের প্রকৃতি, বিশেণ্ডষণকারী তত্ত্বের অন্বেষণ, দূর বার্তার কিংবা গোপন তথ্যের সংকেত ইত্যাদি কৃত্রিম ভাষার অন্ড়র্ভূক্ত। তাছাড়া ভাষা হচ্ছে ভাবের প্রকাশ। ভাবকে দেখা যায় না কিন্তু তার সংকেতকে দেখা যায়, উচ্চারণকে শ্রবণ করা যায়। ভাব বিদেহী হলেও ভাবই ভাষার নিয়ন্ত্রা; মানুষের ভাব সমাজের উর্ধ্বের কোন সত্তা নয়। তাই সমাজবদ্ধ মানুষের ভাবের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে

* প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ।

** এম.ফিল. গবেষক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

সমাজ। ভাষা বাহন হিসেবে এক যুগের জ্ঞান ভা"ারকে পরবর্তী যুগের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। যথোপযুক্ত, বোধগম্য ও র"চিশীল ভাষা সমাজের শান্ড়-শৃঙ্খলা আনয়নে সক্ষম– যা বিশিষ্ট বস্তুর পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে সাধারণ সিদ্ধান্ড় গ্রহণ হচ্ছে জ্ঞানের প্রক্রিয়া। এদিক থেকে যে কোন অর্থবোধক শব্দমাত্রই চিন্ড়ার সাধারণীকরণ। প্রত্যেকটি ভাষার একটি নির্দিষ্ট কাঠামো থাকে। শব্দের উচ্চারণ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক বোধ, বুদ্ধি, যাতনা-চেতনা প্রভৃতি নিয়েই ভাষার কাঠামো গঠিত।[১] ভাষার যৌক্তিক সংশেণ্ঢষণ, বিশেণ্ঢষণ ও যৌক্তিক সমাধান দেওয়া ভাষা দর্শনের কাজ।

ভাষা দর্শন সাম্প্রতিক কালের দর্শন বা ভাষা সম্বন্ধীয় যৌক্তিক বিশেণ্ঢষণী দর্শন নামেও অভিহিত। ভাষা ও পদের যৌক্তিক বিশেণ্ঢষণ এ দর্শনের একটি গুর"ত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সাধারণত বলা যায় যে, দর্শন হলো প্রকৃতির বিষয়ে এক সামগ্রিক ধারণা লাভের অনুসন্ধান, বস্তুর সার্বিক ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টা, জীবন ও জগতের যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন।

সুতরাং ভাষার নানাবিধ সমস্যা নিয়ে দর্শনের যে শাখা যৌক্তিকভাবে আলোচনা করে তাই ভাষাদর্শন (Philosophy of Language)। বস্তুত: দর্শনের চিরাচরিত ধারার আমুল পরিবর্তন সাধনের নিমিত্তে সাম্প্রতিক কালের দর্শনে যে বিশেণ্ঢষণী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তাই ভাষাদর্শন নামে অভিহিত। তাছাড়া সমকালীন দর্শন বিশেণ্ঢষণী বা ভাষা দর্শন নামে অধিকতর পরিচিত। ভাষা দর্শনের প্রথম সূচনা হয় বিশ শতকের গোড়ার দিকে মূলত ব্রিটিশ দার্শনিক জি,ই, ম্যুরের নেতৃত্বে। পরবর্তীতে ম্যুর-রাসেলের যৌথ নেতৃত্বে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। গ্রীণ, ব্রাডলি, ম্যাকটেগার্ট প্রমুখ সে দিনের প্রভাবশালী ভাববাদীদের পরমসত্তা তথা চরম একত্ববাদের বিরোধিতা করে যৌক্তিক বিশেণ্ঢষণের মাধ্যমে এ দর্শনের সূত্রপাত হয়। সুতরাং ম্যুর ছিলেন একালের বিশেণ্ঢষণী দর্শনের তথা যৌক্তিক দৃষ্টবাদী দর্শনের মূল উৎস ও অনুপ্রেরণার অন্যতম মুখপাত্র।[২] এই আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে মূলত: যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক George Edward Moore, Bertrand Russell, Moritz Schilk, A.J. Ayer, Ludwig Wittgenstein প্রমুখ। ভাষা দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাষার প্রকৃতি, তার প্রয়োগ এবং মানুষের চিন্ড়া ও কর্মের ওপর তার প্রভাবের যৌক্তিক বিশেণ্ঢষণ।[৩] যৌক্তিক দৃষ্টবাদ থেকে ভাষা বিশেণ্ঢষণের সূত্রপাত হয় আর ভাষা বিশেণ্ঢষণের সূত্রপাত থেকেই ভাষা দর্শনের শুর" হয়। তাহলে এবার আসা যাক, ভাষা দর্শনের উদ্ভব কখন কিভাবে হয়? বিশ শতকে বিজ্ঞান ও দর্শনের বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি সম্পর্কিত মতবাদকে ১৯৩১ সালে A.E. Blumberg এবং Herber Feighl যৌক্তিক দৃষ্টবাদ হিসেবে ঘোষণা করেন। আর Vienna Circle নামক সম্প্রদায় যৌক্তিক দৃষ্টবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ও ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটান। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বচ্ছতা, স্পষ্টতা ও সার্বজনীনতা ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। ভিয়েনায় এই দার্শনিক আন্দোলন শুর" হলেও অচিরেই এই দর্শন বার্লিন, প্রাগ, সিকাগো, ইংল্যান্ড প্রমুখ জায়গায় বিস্ড়ার লাভ করে। বৃটিশ দার্শনিক A.J. Ayer কর্তৃক এই আন্দোলন বেশ পুষ্টি লাভ করে। যৌক্তিক দৃষ্টবাদ ম্যুর, রাসেল, ভিটগেনস্টাইন এর বিশেণ্ঢষণী, হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়।[৪] ভাষাকে অর্থপূর্ণ করার জন্য

যৌক্তিক দৃষ্টবাদীদের দুটি অবদান উলেণ্ঢখযোগ্য। যথা- (ক) ভাষার যৌক্তিক বিশেণ্ঢষণ (খ) দর্শন থেকে অধিবিদ্যা বর্জন। যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা ভাষার যৌক্তিক বিশেণ্ঢষণ নীতি এবং তাঁদের আবিস্কৃত পরখনীতির মাধ্যমে অধিবিদ্যাকে অর্থহীন বলে যুক্তি দেন। ভাষার যৌক্তিক বিশেণ্ঢষণের মাধ্যমে তারা দেখান যে, প্রধানত দুই ধরনের অর্থে আমরা ভাষার ব্যবহার করে থাকি। যথা- জ্ঞানমূলক (cognative) ও আবেগমূলক (emotive)। তাঁদের মতে, জ্ঞানমূলক বাক্য অর্থপূর্ণ ও আবেগমূলক বাক্য অর্থহীন। যেমন- কুকুর গৃহপালিত প্রাণী- এই বাক্যটি জ্ঞানমূলক আর আলণ্ঢাহ সহায় হন-এই বাক্যটি আবেগমূলক। কিন্তু প্রায় দেখা যায়, আমরা এই দুই প্রকার বাক্যের মধ্যে পার্থক্য করি না। ফলে দার্শনিক চিন্ড়া-চেতনায় বিভ্রান্ড়ির সৃষ্টি হয়। তাই এই দুই প্রকার বাক্যের পার্থক্য স্পষ্টকরণ ও তাদের অর্থ এবং তাৎপর্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে অর্থের যাচাইকরণ তত্ত্ব (verifiaction theory) নামে একটি তত্ত্বের উদ্ভাবণ করেন। ১৯৩৬ সালে মরিশ শিণ্ঢক (Moritz Schlick) তাঁর ***Meaning and Verification*** নামক গ্রন্থে বলেন যে, একটি বচনের অর্থ হচ্ছে তার যাচাই করার পদ্ধতি (The meaning of sentence is the method of its verification)। A.J. Ayer তাঁর ***Language, Truth and Logic*** গ্রন্থে বলেন যে, আমরা উক্তির মাধ্যমে যে বচন করি তা যদি বিশেণ্ঢষণাত্মক অথবা সংশেণ্ঢষণাত্মক হয় তাহলে উক্তিটির জ্ঞানীয় বা আক্ষরিক অর্থ রয়েছে এটা ধরে নিতে হবে। যৌক্তিক দৃষ্টবাদীদের মতে, যাচাইযোগ্যতা দু'রকম। যথা- ক) ব্যবহারিক যাচাইযোগ্যতা খ) নীতিগত যাচাইযোগ্যতা। প্রত্যক্ষভাবে যেটা যাচাই করা যায় তাই ব্যবহারিক যাচাইযোগ্যতা। আর যা প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করা যায় না তাকে নীতিগতভাবে যাচাই করতে হয়। একটি উক্তিকে দুর্বলভাবে যাচাইযোগ্য বলা হবে তখনই যখন উক্তিটির সত্যতা আমাদের অভিজ্ঞতায় সম্ভাব্য বলে প্রতিপাদন করা যায়। তবে নীতিগতভাবে যাচাইযোগ্য না হলে তার পর্যবেক্ষণের কথা ভাবা যায় না এবং তার সাহায্যে বিবর্তন ও অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ড় নেয়া যায় না। তদ্র"প ধরা যাক, এক ধরনের মন্ড় ব্যকারী এমনভাবে ইংরেজি ব্যবহার করছেন যেভাবে সচরাচর ইংরেজি ভাষাভাষি লোকেরা ইংরেজি ব্যবহার করেন এবং তার প্রকৃত ইচ্ছাও এমন কিছু বলা যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যাচাই করা যায়। কিন্তু যে মতটি তিনি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক, যতক্ষণ পর্যন্ড় তিনি আমাদের তা যাচাই করার উপায়টি বুঝিয়ে না দিচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ড় তাঁর সঙ্গে আমাদের ভাব বিনিময় ঘটবে না। তাঁর ব্যবহৃত শব্দগুলো দ্বারা তিনি যা প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা নীতিগতভাবে যাচাইযোগ্য কোন মত নয়। কিন্তু তিনি যদি এটা স্বীকার করেন তাহলে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করা যেতে পারে যে, তিনি এমন কিছু উচ্চারণ করেছেন তাঁর নিজের কাছেও তার কোন শাব্দিক তাৎপর্য নেই। এ প্রসঙ্গে যাচাইযোগ্য শব্দটির সবল ও দুর্বল অর্থের পার্থক্য দেখানো যায়। কোন মতামতকে সবল অর্থে যাচাইযোগ্য বলা হবে যদি এবং কেবল যদি, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চুড়ান্ড় ভাবে তার সত্যতা প্রতিপাদন করা যায়। কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার সম্ভাব্যতা প্রতিপাদন করলে তা হবে দুর্বল অর্থে যাচাইযোগ্য। তাই যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা চুড়ান্ড় ভাবে যাচাইযোগ্যতাকে অর্থপূর্ণতার মানদ" হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলেছেন।[৫] এবার অর্থবহ শব্দসমষ্টিকে এমনভাবে সাজাতে হবে যার ফলে বাক্য বা বচনটি একটি সুস্পষ্ট অর্থ বহন করে। হারমোনিয়ামের রীডগুলো যেমন খুশিমত টিপলে শুধু ধ্বনি বের হয়ে আসে কিন্তু কোন ঐক্যতানের সৃষ্টি হয় না তেমনি শব্দগুলোর উচ্চারণ

করলেই বাক্য হবে না। একটা নিয়মে এদেরকে সাজিয়ে উচ্চারণ করতে হবে এবং এ সাজানোকে বলা হয় পদবিন্যাস (Syntax)। তাই পদবিন্যাস অনুযায়ী বাক্য গঠন করতে হয়। Rudolf Carnap তাঁর ***The Logical Syntax of Language*** গ্রন্থে বলেন,

কোন ভাষার যৌক্তিক বাক্যতত্ত্ব বলতে আমরা বুঝি সেই ভাষার ঐ সমস্ড় ভাষাগত নিয়ম-নীতি। আর সেই সমস্ড় নিয়ম-নীতিগুলোর নিয়ম-মাফিক উপস্থাপন; যে নিয়ম-কানুনগুলো সে সকল ফলাফলকে নিয়ন্ত্রণ করে- যা ঐ সমস্ড় নিয়ম-কানুন থেকে উদ্ভাবিত হয়।[৬]

Bertrand Russell এর যৌক্তিক পরমানুবাদও ভাষা ও অভিজ্ঞতার সম্পর্ক নিরূপণে নিয়োজিত। রাসেল বলেন যে, দর্শনের কাজ হলো যৌক্তিক বিশেণ্ডষণ ও পরে যৌক্তিক সংশেণ্ডষণ। তাঁর মতে বিশেণ্ডষণের বস্তু হলো বৈজ্ঞানিক তথ্য ও অভিজ্ঞতা। কিন্তু তাদের তাদের বিশেণ্ডষণের পূর্ব শর্ত হিসেবে প্রয়োজন ভাষা বিশেণ্ডষণ। কেননা, দার্শনিক চিন্ড়ার ওপর ভাষার প্রভাব অত্যন্ড় গভীর। তিনি লক্ষ্য করেন যে, ভাষার বাক্য-বিন্যাস, পদ্ধতি ও শব্দ সম্ভার নানা দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ। এ ত্রুটিগুলো আমাদের চিন্ড়াকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। যার ফলে বিভিন্ন উদ্ভট ও তাত্ত্বিক মতবাদের সৃষ্টি হয়। তাই তিনি উপলব্ধি করেন যে, ভাষার যৌক্তিক বিশেণ্ডষণের সাহায্যে ত্রুটিগুলো দূর করা প্রয়োজন। এবং তাতে করেই জগতের সঠিক কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে।[৭] তিনি অর্থ অনুধাবণের জন্য শব্দ এককের পরিবর্তে বাক্যের এককের ওপর জোর দিয়েছেন এবং বক্তার নিরীক্ষণমূলক উক্তিকেই মৌলিক বাক্য বলেছেন। জি.ই. ম্যুর ভাষার যৌক্তিক বিশেণ্ডষণ এবং শব্দ ও ধারণাবলীর অর্থ পরিষ্কারকরণের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। Wittgenstein তাঁর ***Tractatus Logico Philosophicus*** গ্রন্থে উলেণ্ডখ করেন ভাষা হল বাস্ড়বতার চিত্র বিশেষ। জগৎকে নিয়ে ভাল কাজ করার ফলে ভাষায় ব্যবহৃত বচনের প্রতিটি অংশের সঙ্গে জগতের এক ঘনিষ্ঠ সমন্বয় বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে Wittgenstein শুধুমাত্র মৌলিক এবং যৌগিক বচনকেই অর্থপূর্ণ বলে স্বীকার করেন। তাঁর মতে, অধিবিদ্যক উক্তিসমূহ মৌলিক ও যৌগিক কোনটির পর্যায়ে পড়ে না ফলে সেগুলো অর্থহীন। কেননা বিশেষভাবে দেখলে মনে হয় শব্দ বা বাক্য কোন না কোন দিক দিয়ে অ-ভাষিক জগতের সংগে কোন ধ্বনি প্যাটানের নিজস্ব কোন অন্ড়র্নিহিত বৈশিষ্ট্য নেই ফলে সেই ধ্বনি প্যাটার্ন বর্হিজগতের কোন দিককে আবশ্যিকভাবে নির্দেশ করে। আর ভাষা অন্যান্য সামাজিক বিষয়ের ন্যায় একটি সামাজিক বিষয়।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা সমুদয় অধিবিদ্যক বাক্যকে অর্থহীন বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং তাদের অন্যতম গুরু বলে বহুল স্বীকৃত ভিটগেনস্টাইন তাঁর ***Tractatus Logico Philosophicus***-এ বৈজ্ঞানিক উক্তি ছাড়া সব উক্তিকে অর্থহীন বলে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন।[৮] তাঁদের সকলের মূল বক্তব্য ছিল এরূপ: তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণার সাহায্যে বিমূর্ত বা অতীন্দ্রিয় সত্তা আবিষ্কার দর্শনের কাজ নয়, বরং দর্শন ভাষার যৌক্তিক বিশেণ্ডষণ এবং শব্দ ও ধারণাবলীর অর্থ পরিষ্কার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভাষা দর্শনের একমাত্র কাজ ভাষার চুলচেরা যৌক্তিক বিশেণ্ডষণ করা।

ভাষার সাথে চিন্ড়ার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। চিন্ড়া ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাই M. Black বলেন,

ভাষা শুধু ধারণা আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে প্রতীয়মান হয় না। বরং ভাষা হচ্ছে- সেই উপাদান যা দ্বারা ধারণাসমূহ গঠিত হয়। চিন্ড়াসমূহকে তাদের প্রতীকী উপস্থাপন থেকে পৃথক করতে চাওয়া আর মানস মনকে তার দৈহিক অংশ থেকে পৃথক করার চেষ্টা, একইরকম ফলহীন প্রচেষ্টা।[৯]

প্রথমত: ভাষার প্রধান কাজ হলো মনের ভাব প্রকাশ করা। দ্বিতীয়ত: যোগাযোগ স্থাপন করা। তৃতীয়ত: শব্দের অর্থ এবং বাক্যের অর্থ খুঁজে ফেরা, ভাষাগত ক্রিয়া ভাষার বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ, ভূমিকা ইত্যাদি ভাষা দর্শনের অন্ড়র্ভূক্ত। ভাষা দর্শনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হলো বাক্যগঠন ও রীতি-নীতি। এটা সুস্পষ্ট যে, চিন্ড়ার ক্ষেত্রে শব্দার্থ ও বাক্যরীতি ভাষা দর্শনের মুখ্য ব্যাপার। তবে এ কথাও সত্য যে, ভাষা মানুষের চিন্ড়াকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তবে অপরদিকে একথাও সত্য যে, ভাষার দ্বারা মানুষের চিন্ড়া সীমিত ও বিভ্রান্ড়ও হয় এবং সেজন্য যুক্তিবিদ্যার পাশাপাশি ভাষা চর্চাকেও নির্ভুল তত্ত্বচিন্ড়ার এক অপরিহার্য শর্ত বলে মনে করা হয়।

প্রসংগত: এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক জি.ই.ম্যুর (১৯৭৩-১৯৫৮)। তিনি তাঁর '*The Refutation of Idealism* (1903)' এবং '*A Defense on Common Sense* (1925)' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে আধ্যাত্মবাদী মতবাদ খন্ডন এবং বিশেণ্ডষণধর্মী যৌক্তিক দর্শনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেন। তিনি আরো বলেন, দর্শনের কাজ প্রচলিত ভাষায় গোটা জগতের সাধারণ ব্যাখ্যা দেওয়া এবং বর্হিজগৎসহ জড়বস্তু ও মানসিক ঘটনাবলীর অস্ড়িত্বকে সাধারণ জ্ঞানের মাধ্যমে সমর্থন করা। তিনি বলেন, সচরাচর দার্শনিকরা জগতের মৌলিক প্রশ্নাবলী ও সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু আগে যেভাবে যে বিষয়গুলো নিয়ে দার্শনিকরা আলোচনা করেছেন সেভাবে আর বসে নেই বর্তমানে অনেক বিবর্তন পরিবর্তন হয়েছে। একই জিনিসকে দার্শনিকরা বিভিন্ন দিক থেকে বিশেণ্ডষণের চেষ্টা করেছেন। যেমন বিশেণ্ডষণী দার্শনিকরা মন বা আত্মা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন না তুলে তারা অন্যভাবে চিন্ড়া করতে পারেন (They may think about the concept of mind) যেমন: মন বা আত্মা শব্দ কি অর্থে ব্যবহার করা হয়। আর শব্দের ব্যবহার নিয়ে আবর্তিত ও বিবর্তিত রূপটাই ভাষাদর্শন। এখানে উলেণ্ডখ্য যে, ভাবের আদান-প্রদানের (communication) এর মূল পদ্ধতি হচ্ছে লিখিত অথবা কথিত ভাষার ব্যবহার। ভাষা দর্শনের মূলত: তিনটি ধারা। যথা:

i) Frege-Russell- Carnap approach
ii) Wittgenstein Ian approach (Investigation)
iii) Quinean tradition এটাকে Quinean extentionalism বলা হয়।

উপরোক্ত সূত্র ধরে ভাষা প্রয়োগের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা বের হয়ে আসে। এগুলো হচ্ছে ভাষার বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ- যাকে আমরা বলব Frege-Russell- Carnap approach, ভাষার আবেগিক প্রয়োগ- যাকে বলব Wittgenstein Ian approach (Investigation) ও নির্দেশাত্মক প্রয়োগ যাকে বলব Quinean tradition এটাকে Quinean extentionalism বলা হয়। এখানে উলেণ্ডখ্য যে, বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ

শুধুমাত্র বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত প্রয়োগ নয়; এর অর্থ ভাষার আক্ষরিক বা শুদ্ধ বর্ণনাত্মক প্রয়োগ। যেহেতু বিজ্ঞানের লক্ষ্য জগৎ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান পরিবেশন করা সেজন্য তার সর্বত্র ভাষার প্রয়োগ অপরিহার্য। সে কারণেই বিজ্ঞানকে আদর্শ হিসেবে ধরে এ প্রয়োগের নাম দেয়া হয়েছে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ। এটা মূলতঃ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয় ইতিহাস, দর্শন এমনকি দৈনন্দিন কথাবার্তায় ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয়। ভাষার আবেগিক প্রয়োগ হচ্ছে বক্তার আবেগ বা মনোভাব প্রকাশ করা এবং শ্রোতার মনেও সে আবেগের উদ্রেক ঘটানো। আবার ভাষার নির্দেশাত্মক প্রয়োগ মূলতঃ প্রয়োজনমূলক—এর লক্ষ্য হচ্ছে শ্রোতার মধ্যে বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তি ঘটানো। দর্শনের ক্ষেত্রে ভাষা প্রয়োগের যথার্থ ব্যবহারের ফলে একটি থেকে অপরটিতে অবচেতনের মধ্যে দিয়ে যে ভাষাগত ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে তা ভালভাবেই অনুমান করা যায়।

আবার বাক্য বা বচনের আকারগত অভিন্নতা থেকে তাদের আসল বক্তব্য সম্পর্কে এক ধরনের ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এই আকারগত অভিন্নতা 'ব্যাকরণগত'—যা ভাষার সাধারণ লৌকিক প্রয়োগ থেকে প্রাপ্ত। এই ব্যাকরণগত অভিন্নতার পর্দা সরিয়ে তাদের যথার্থ যৌক্তিক (logical) আকার উন্মোচন করলে দেখা যায়, বাক্য বা বচনগুলোর অর্থ এবং তাদের আসল বক্তব্য ও ব্যঞ্জনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।[১০]

এই তিনটি ধারার প্রথম ধারাটি হলো ভাষিক বিনির্মাণবাদের ধারা। ভাষা দর্শনের মূলকথা হলো ভাষাদার্শনিকগণ দার্শনিক সমস্যা নিরসন এবং ভাষার যৌক্তিক কাঠামোর জন্য Linguistic approach কে গ্রহণ করেন। অধিবিদরা বারবার নানাভাবে ভাষার দ্বারা বিভ্রান্ড় হয়েছেন। যেমন দ্রব্য (Substance) ও সত্তার অধিবিদ্যক ধারণা প্রসঙ্গে এ জে এয়ার তাঁর ***Language, Truth and Logic*** গ্রন্থে বলেন যে, উভয় ক্ষেত্রে অধিবিদরা ব্যাকরণ অর্থাৎ সাধারণ ভাষার মৌলিক বিশেণ্ডষণ দ্বারা বিভ্রান্ড় হয়েছেন। প্রথম ক্ষেত্রে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর গুণগুলো উলেণ্ডখ করতে গেলেই আমাদেরকে কতকগুলো "উদ্দেশ্য বিধেয়" জাতীয় বাক্য ব্যবহার করতে হয় যাদের মধ্যে একাধিক বিধেয়পদ গুণগুলোর স্থান দখল করে আছে, অথচ একটি মাত্র পদ উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এভাবেই অধিবিদদের মনে ধারণা জন্মে যে, একই দ্রব্য আধার হিসেবে গুণগুলোকে নিজের মধ্যে ধরে রাখছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যেহেতু অস্ড়িত্ববাচক বাক্য আকারের দিক থেকে প্রকৃত উদ্দেশ্য বিধেয় বাক্যের সদৃশ ("Martyrs suffer", "Martyrs exist") এবং যেহেতু এ জাতীয় বাক্যে একটি গুণকে কোন কিছুতে আরোপ করা হয়। সুতরাং অধিবিদরা অস্ড়িত্বকেও একটি গুণ বলে ধরে নেন এবং কোন প্রকৃত গুণের ন্যায় একে নিয়েও আলাদাভাবে চিন্ড়া করতে শুর" করেন।[১১] যেহেতু তারা মনে করেন দার্শনিক সমস্যা হচ্ছে ভাষার সমস্যা সেহেতু তারা ভাষা বিশেণ্ডষণকে দার্শনিক সমস্যা নিরসনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন। এদের মতে দার্শনিক বিশেণ্ডষণ মানেই হচ্ছে দার্শনিক সমস্যার ভাষিক সমাধান। উলেণ্ডখ্য যে আদর্শ ও সাধারণ ভাষা দার্শনিকগোষ্ঠী বিশেণ্ডষণকেই দার্শনিক সমস্যা নিরসনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেন। তবে এগুলো ভিন্ন প্রকৃতির। এই দুইটি ধারার প্রকৃতি সম্পর্কে পার্থক্য করতে গিয়ে Bergman তাঁর ***Logic & Reality*** গ্রন্থে বলেন, "Which language is suitable to talk about the world"। ভাষিক বিনির্মাণবাদের প্রবক্তা হলেন আদর্শ ভাষা দার্শনিকগণ। এরা মনে করেন যে, প্রাকৃতিক ভাষা অস্পষ্ট ও

বিভ্রান্ড়িকর। এই ভাষা দার্শনিক বিষয়াবলী প্রকাশের জন্য অনুপযোগী। এ প্রসঙ্গে Gattlob Freege মন্ড়ব্য করেন যে, প্রাকৃতিক ভাষা চিন্ড়ার জন্য ত্র"টিপূর্ণ যন্ত্র (natural language are defective instrument for thought). আরও বলা যায়, এই তিনটি ধারার দ্বিতীয় ধারাটি (Wittgenstein lan approach) হচ্ছে ভাষিক প্রকৃতিবাদ (linguistic naturalism)। এ দলে J.L. Austinও রয়েছেন। এই ধারার দার্শনিকদের সাধারণ ভাষা দার্শনিক (ordinary language philosopher) বলা হয়।

সাধারণ ভাষা দার্শনিক গোষ্ঠীর অন্যতম প্রবক্তা Ludwig Wittgenstein (1889-1951)। তিনি দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। যথা-

i) Tractatus Logico Philosophicus

ii) Philosophical Investigations

উলেণ্ডখ্য যে, Wittgenstein তাঁর ***Tractatus Logico Philosophicus*** গ্রন্থে আদর্শ ভাষা দার্শনিক গোষ্ঠীর (ideal language school) সমর্থক। কিন্তু ***Philosophical Investigations*** গ্রন্থে তিনি ভাষা সম্পর্কে Tractatus এ তাঁর প্রদত্ত অভিমতকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে সাধারণ ভাষা দার্শনিক গোষ্ঠীর (ordinary language school) একজন অন্যতম সমর্থক ও প্রবর্তক।

বিনির্মাণবাদের আলোচনায় দেখা যায় দার্শনিকরা ভাষার মডেলের চিন্ড়া করেন। তাঁদের মূলকথা প্রাকৃতিক ভাষা নির্দিষ্ট আকারশুন্য। তাঁরা মনে করেন এটা ভাষার বড় ধরনের অপর্যাপ্ততা। তাই তারা ভাষার জন্য একটা formulize language এর কথা বলেন। যেখানে বিধি বা নিয়ম অনুযায়ী ভাষাকে ব্যাখ্যা করা হবে। অপরদিকে Linguistic Naturalism এর সমর্থকরা বলেন, Language হলো phenomena একে structure এ ফেলা যাবে না। ভিটগেনস্টাইন বলেন,

আমরা অনুভব করি, যেন আমাদের অবভাসের মৌলিকতাকে অন্তর্নিহিতভাবে স্পর্শ করতে হয়: আমাদের অনুসন্ধান, অবভাসের অভিমুখে নয় বরং অবভাসের সম্ভাবনামুখী।[১২]

অর্থাৎ ভাষা আমাদের ভাবের আদান-প্রদান ও চলার পথের আধেয়কে পরিস্কার করে সম্ভাবনাময় জীবনের গতিকে বাস্ড়বে রূপায়ন করতে সচেষ্ট। তাই ভাষাকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চালাতে হবে। বিধি বা নিয়মকানুন দেয়া ঠিক হবে না। ভাষা যেভাবে আছে সেভাবেই করতে হবে বরং Theory করলে সমস্যা হবে। তাই তারা operationalistic এবং functionlistic analysis এর কথা বলেন। Form এ সাজালে ভাষার ব্যাপকতা নষ্ট হয়। ভাষা সাবলীলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যতা হারায়। Systematic করতে চাইলে ভাষার প্রবণতা ঠিক থাকে না। তাই সাধারণ দার্শনিকদের মতে ভাষার কাজ ভাবের আদান-প্রদান (communication) অর্থতত্ত্ব (theory meaning) হচ্ছে ভাষার ব্যবহৃত বিধিগুলো যথার্থ প্রকাশ। এই নিয়ে নতুনভাবে চিন্ড়া করার প্রয়োজন নেই। Phenomena সম্পর্কে D.J. Manning বলেন,

অবভাসের অভিন্নতা জানতে হলে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত অন্য অবভাসের ভাব ভাষা বুঝতে হবে। কোন অবভাসের নির্দিষ্ট সময়ের কোন পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে হলে এর

অবস্থার রূপান্ড়র সম্পর্কিত পরিবর্তন যাচাই বাছাই করতে হবে। এটা লক্ষ্যনীয় যে, কোন নির্দিষ্ট অংশ পরিবর্তিত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।[১৩]

অর্থাৎ অবভাসকে যেমন নির্দিষ্ট ফ্রেমে সাজানো যায় না তেমনি ভাষাকেও নির্দিষ্ট ফ্রেমে সাজানো যাবে না। Tractatus-এ wittgenstein এর অবস্থান ছিল ভাষাকে logically framework দিয়ে ব্যাখ্যা করা কিন্তু Investigations-এ মত পরিবর্তন করে ভাষার আসল অন্ড়র্নিহিত ভাবের (actual observable form) ওপর গুর"ত্বারোপ করেন। Tractatus লেখার পর তিনি দর্শন লেখা বন্ধ করে দেন এবং মনে করেন দর্শনের সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে নতুন করে দর্শন চিন্ড়ার আর প্রয়োজন নেই কিন্তু Cambridge-এ ফিরে এসে তিনি ক্লাশ নিতে গিয়ে ছাত্রদের সাথে মিশে নতুন ভাবনা মাথায় আসে এবং ১৯৫৩ সালে Investigations লিখেন। Feigl বলেন,

প্রায় এই ধারাবর্জিত অত্যন্ড় চমৎকার পদ্ধতিটি মূলত: যতটা মনে হয় যে, পুরনো যৌক্তিক দৃষ্টবাদী প্রয়োগবাদীদের সমকক্ষ হওয়া বা অতি নিয়মানুবর্তিতাপূর্ণ যৌক্তিক বিনির্মাণবাদ থেকে ততটা ভিন্ন নয়।[১৪]

Wittgenstein বলেন, দার্শনিক সমস্যার সৃষ্টি হয় ভাষার ভুল ধারণা থেকে; এর অন্যতম কারণ ভাষাকে গণিতের মডেল অনুযায়ী তৈরী করা। আমরা যখন কোন ভাষা গঠন করি তখন structure-এ ফেলার চেষ্টা করি। আর structure এ দেয়ার চেষ্টা করতে গেলে ভাষার মূল Spirit নষ্ট হয়। আমরা যেসব শব্দ ব্যবহার করি তা এক এক প্রেক্ষিতে এক এক রকম ব্যবহার করা হয়। সকালের যাচ্ছি আর বিকেলের যাচ্ছি এক নয়। কোন শ্রেণীর বস্ত্ত বা ধারণা সম্পর্কে মাথা ঘামালে প্রথমে সাধারণ ধারণা মাথায় আসে। মাঠে যে পশু ঘাস খায় তাই গর" এটা ভাবা ঠিক নয়। কারণ গর" ছাড়া ছাগল, ঘোরাও ঘাস খায়। তেমনি মানুষের সাধারণ ধারণা থেকে বৈশিষ্ট্য দেয়া যায় না (অর্থাৎ structure এ ফেলা যায় না)।

বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা ভাষাকে Generalize বেশি করেছেন। Wittgenstein'র মতে Generalize এর ফলে ভাষার সমস্যা হয়। Wittgenstein বলেন, টেবিলের ধারণা করার ফলে নির্দিষ্ট কিছু মাথায় আনা ঠিক নয় যে, একমাত্র পড়ার জন্যই ব্যবহৃত বস্ত্তটাই টেবিল। শুধু পড়ার বস্ত্তটাই টেবিল এমন চিন্ড়া করলে এর বাইরে তো অন্যকিছু ভাবা যাবেনা। অথচ অন্যান্য কাজেও টেবিল ব্যবহৃত হয়। যেমন: আপ্যায়নে, T.V দেখার জন্য, ক্লাশ লেকচার এর জন্য ইত্যাদি।[১৫] তাই Wittgenstein বলেন, নির্দিষ্ট আকার মাথায় গঠন করাই সমস্যা; এটাই ভাষার অপব্যাখ্যার মূল কারণ। তাই তিনি বলেন, শব্দের ব্যবহার নির্দিষ্ট কোন framework এ সাজানো যাবেনা। দার্শনিকরা কোন ধারণা বা ভাষা ব্যবহার করার সময় নিজস্ব ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। এ সম্পর্কে Wittgenstein বলেন,

যখন আমরা দর্শন পড়ি তখন মনে হয় আমরা যেন অসভ্য আদিম মানুষের মত যারা সভ্য লোকদের কথা শোনে তা থেকে ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং সেখান থেকে একটি অদ্ভুদ সিদ্ধান্ড় নেয়।[১৬]

অর্থাৎ দার্শনিকরা সব সময়ই নিজস্ব ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

আসলে প্রত্যেকের চাহিদা বা চিন্ড়া-ভাবনার মধ্যে ফারাক পার্থক্য নেই। এখানে যে পার্থক্যটা তা হচ্ছে ভাষাগত দূর্বোধ্যতা। এই দূর্বোধ্যতা দূর করতে পারলেই দর্শনের সমস্যার সমাধান অনেকটাই সম্ভব হয়ে যাবে। Wittgenstein আরও বলেন, দর্শন হচ্ছে ভাষার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানকে যাদু করার বির"দ্ধে একটি যুদ্ধ।[17]

তিনি Tractatus এর ধারণা পরিত্যাগ করে শব্দের বহুমাত্রিক ব্যবহার করেন এবং বলেন ভাষার একার্থক অর্থ নির্মাণের জন্য প্রয়াসী ছিলাম যা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমরা যখন ভাষা ব্যবহার করি তার মধ্যে নানারকম বিষয় আসে। বিভিন্ন উপাদানগুলো বিভিন্নভাবে ব্যবহার হয়। তাই ভাষার মধ্যে common element নেই। আদেশ ও উপদেশ একরকম নয়। কাজেই দুটোর রেজাল্ট দু'রকম হবে। তাই ভাষার মধ্যে common essence পরিহার করার চেষ্টা করতে হবে। Wittgenstein বলেন, "The grammatical structure of sentences could be grossly misleading"

ব্যাকরণের কাজ হচ্ছে বিধি দেয়া এবং সেই মোতাবেক ভাষাকে ব্যাখ্যা করা। তিনি বলেন এই নিয়ম বেধে দিলে ভাষা তার সার্বজনীনতা হারায়। এজন্য তিনি Grammar কে পরিত্যাগ করেন। তিনি আবার Investigations এ বলেন,

আমাদের অনুসন্ধান হচ্ছে ব্যাকরণগত। এই ধরনের অনুসন্ধান ভুল বোঝাকে দূরে সরিয়ে আমাদের সমস্যার ওপর আলোকপাত করে।[১৮]

এতে মনে হচ্ছে তিনি grammar এর ওপর গুর"ত্ব দিয়েছেন কিন্তু আসলে তা নয় বরং ভাষার ব্যবহারের ওপর গুর"ত্ব দিয়েছেন। কাজেই Tracktatus এবং Investigations-এ যা করতে চেয়েছিলেন তা ভিন্ন জিনিস। তাহলে এটা স্পষ্ট যে, শব্দের অর্থ নির্ভর করছে ভাষার ব্যবহারের ওপর। এখানে ভাষাকে খেলার সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন খেলার সাথে খেলার নিয়ম শেখা যায় তেমনি ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমেই ভাষার নিয়ম শেখা হয়ে যায়।[১৯] অর্থাৎ ভাষা মানে হচ্ছে ভাষার নিয়মের ব্যবহার। এজন্যই Wittgenstein তার আগের মত পরিবর্তন করে বলেন প্রাকৃতিক ভাষা ভাবের আদান-প্রদানের (communication) উত্তম হাতিয়ার। সাধারণ ভাষার যেসব নিয়ম আছে তা ঠিকমত ব্যবহার করলে ভাষা সম্পর্কিত কার্যাবলী সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হবে আর এটাই Linguistic Naturalism.

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যার সমাধানকল্পে ভাষার যৌক্তিক বিশেণ্ডষণ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নির্বাচন করেছি। মূলত ভাষাকে প্রাকৃতিকভাবে ব্যবহার করে ভাষার কাঠামো ভেঙ্গে এর বহুমাত্রিক ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বসাধারণের বোধগম্যতার মধ্য দিয়ে ভাষার অস্পষ্টতা ও দূরবোর্ধ্যতা পরিহার করে ভাষিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। আর দার্শনিক সমস্যার সমাধানে ভাষিক প্রকৃতিবাদ অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ। এই ভাষিক সমাধানের মাধ্যমে আমরা জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক অগ্রযাত্রাকে সমুন্নত রেখে জগতের সার্বিক কাঠামো নির্মাণ করতে পারি। তাই ভাষা দর্শনে ভাষিক প্রকৃতিবাদ একটি অনবদ্য অবদান রাখার দাবিদার।